বাগে পেয়েছিল একেবারে।' (আমার ব্যঘ্রপ্রাপ্তি)। অনুপ্রাসজাতীয় এই শব্দগুলি মিল তৈরির অদ্ভুত ক্ষমতা থেকে একজাতীয় রসবোধ তৈরি করে। আবার উপসর্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থভেদে Pun তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন –'গ্রহে আর কি জবাব দেবে? সে এখন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে।' (হাতির সঙ্গে হাতাহাতি)। এ ছাড়া নানা গল্পগ্রন্থ বা গল্পের নামকরণেও এই শব্দ–ধ্বনির খেলা অভিনবত্ব নিয়ে আসত। এই প্রসঙ্গে 'ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা', 'নাম নিয়ে নাকাল', 'স্বামী মানেই আসামী' — প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের উদাহরণ দেওয়া যায়।

তবে শব্দ নিয়ে এই খেলা কখনও বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে শিবরামের রচনাতে রসচ্যুতি ঘটিয়েছে। 'পান'–এর দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক তাঁর গল্পের বাঁধুনিকে ঢিলে করে দিয়েছে। চরিত্রেরাও শিথিল ও অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছে। পরিমিতির এই অভাব অনেক ক্ষেত্রেই শিবরামের বক্তব্যের চমককে নষ্ট করে দিয়েছে এবং একঘেয়েমি এনেছে। যেমন ধরা যাক শিবরামের বিখ্যাত গল্প 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। সেখানে তিনি হর্ষবর্ধনের জবানিতে বলেছেন, 'তুমি হচ্ছ একটা কী বলব? আসলে বয়েজ গাউট',বুঝেছ। বয়স্কাউট কখনই নয়।'... বয়েজ মানে ছেলের আর গাউট হচ্ছে বাত।' বয়েজ গাউট ছেলের বাত।' এ ভাবেই হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের কথোপকথন সূত্রে আমরা পাই 'যা একখানা বয়স গৌটের পাল্লায় পড়েছিলুম আজ। 'বয়েজ গৌট' ... বয়স মানে বয়েস, তবে যদি বায়স হয় তাহলে ওর মানে হবে গিয়ে কাক। ... আর গৌট হচ্ছে... গৌ –অর্থাৎ কিনা একটা গরু। গোরুর পিঠে একটা বায়স, মানে কিনা, একটা কাক গোরুর পীঠস্থানে বসেছিল বুঝি।' এভাবেই বয়স্কাউট, 'বয়েজ গৌট' প্রভৃতি শব্দ এমনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যে পাঠ করতে গিয়ে ধন্দে পড়ে যাচ্ছেন পাঠক। পাঠমগ্নতায় বারবার ছেদ পড়ছে।

একাধারে কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকের পাশাপাশি একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ছিলেন শিবরাম। ধর্ম, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আধ্যাত্মিকতা, বলশেভিজম, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ ধ্যানধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরী', 'অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য', 'দো রোখা', 'ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্ততা', 'সাধারণ মানুষ ও সুপারম্যান', 'সুপার ম্যানিয়া', 'কবিজয়ন্তী', 'সংঘ মানে সাংঘাতিক', 'শুদ্র না ব্রাহ্মণ', 'বিজ্ঞানের সার্থকতা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল। 'আত্মশক্তি' ও সমসাময়িক কয়েকটি পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

শিবরাম মনে করতেন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ হল সেই মতবাদ, যা নিরন্তর শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে নিপীড়িত জনগণকে প্রগতি ও উন্নয়নের পথ দেখায়। ভগবানের নামযশ করতে শেখায় না। সাম্যের সেই মূল সুরটিকেই ধরতে চেয়েছিলেন শিবরাম এবং সেই কারণেই তাঁকে 'গুরুনিন্দা' করতে হয়েছে। ধর্মীয় পাণ্ডাদের মহিমা বা সংস্কারসর্বস্ব রীতিনীতিকে উড়িয়ে শিবরাম যে এগারোটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে প্রচুর সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতাকে সঞ্চারিত করার জন্য তিনি দায়ী করেছেন ধর্মপ্রচারকদের। তাই তিনি বলতে পেরেছেন 'রামকৃষ্ণের কথামৃতের কথায় এবং অমৃতত্বে যে আমরা বিশ্বাস করি, তার গোড়ায় বেলুড়মঠের অতবড় বিজ্ঞাপন।' (সংঘ মানেই সাংঘাতিক)। তাঁর 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরী' নামক মননশীল প্রবন্ধটিকে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তিনি সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ঠাট্টার সুরে বলেছেন 'এটি হল মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি আর পন্ডিচেরী নিয়ে মস্করা'।

অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর পরস্পরবিরোধী অবস্থান সন্দেহের উদ্রেক করে। যেমন বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন 'বুদ্ধদেবের আমলে এই ভারতবর্ষেই সাম্যবাদের প্রথম সূচনা হয়েছিল...' (অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য)। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন 'জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন...' (মস্কো বনাম পন্ডিচেরী)। আসলে সনাতন হিন্দুধর্মের নিন্দা করা শিবরামের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভণ্ড মানুষজনের দ্বারা উপস্থাপিত ধর্মের অপব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন তিনি। দেবে। যুক্তিবাদী মননের সাহায্য নিতে খণ্ডন করেছেন নলিনীকান্ত গুপ্তের গীতা — উপনিষদের তত্ত্বকথাকে। মহেন্দ্র রায়ের 'একরোখা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে' ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সুরেশ চক্রবর্তীর অতিমানববাদ ও দিলীপ রায়ের বিজ্ঞানচিন্তনকে আক্রমণ করেছেন। ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবকল্যাণকে স্থান দিয়ে সেই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন লেখক।

এইক্ষেত্রে শিবরামের বিখ্যাত 'দেবতার জন্ম' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পকথক লেখক হোঁচট খাওয়ার ভয়ে বাড়ির সামনের একটি ছোট্ট পাথরকে স্থানান্তরিত করেন। অশ্বত্থতলায় তার স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার পরই সেখানে কয়েকজন সন্ন্যাসী সেখানে আস্তানা করেন। সেই মাহাত্ম্যে পাথরটিকে ত্রিলোকেশ্বর শিব কল্পনা করে জায়গাটি ঘিরে একটি মন্দির গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে শহরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মহামারী থেকে বাঁচতে গল্পকথক Veridinum 200 ডোজ নেন। কবিরাজের কাছ থেকে কন্টিকারির শেকড় বেটে খান। মায়ের দেওয়া হত্তুকি হাতে বাঁধেন। অথচ চরণামৃত খেয়ে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে ওই নাস্তিক গল্পকথককে শেষপর্যন্ত ত্রিলোকনাথের কাছে নিয়ে আসে। বসন্ত রোগ থেকে নিস্তারের জন্য তাঁকে ওই দেবতাসদৃশ পাথরটির কাছেই প্রার্থনা করতে হয়। শিবরামের এই দুর্দান্ত গল্পটিকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

আসলে ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে নতুন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন শিবরাম। রুশ বিপ্লব তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল। তিনি মনে করতেন শ্রমিকরাই সভ্যতার আসল স্রষ্টা। আদর্শ অর্থনীতি অনুসারে 'বণ্টন'এ ধনবৃদ্ধি হয়, 'কাঞ্চন'এ নয়। 'একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা। এর নাম ক্লাসওয়ার।' এর থেকে সমাজের নিষ্কৃতি নেই। তাই 'আত্মার দারিদ্র্য নয়, আর্থিক দারিদ্র্য দূর করাই কমিউনিজমের কাজ।' সামাজিক নানা প্রবন্ধে বহু দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন তিনি। যেমন (ক) 'সংঘ মানেই সাংঘাতিক'। সংঘের যিনি কেন্দ্রমূল তিনি 'ঘ'–ঘ–এ ঘুঘু। বাকি সকলেই সঙ। সঙদের নিয়ে যার আরাম তিনিই সংঘরাম। (সংঘ মানে সাংঘাতিক)।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন শিবরাম। শিবরাম বলেছেন (ক) 'তাঁর কবিতার জন্য তিনি সম্পূর্ণ নন — তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর জীবন বড়, তিনি কবিতা না লিখলেও পারতেন। (সুপারম্যানিয়া) (খ) বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট অপকর্ম (কবি জয়ন্তী)। বিশ্বভারতীর ব্যর্থতার পিছনে নানা কারণও তুলে ধরেছেন শিবরাম। প্রথমত, তপোবন সুলভ প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন এ যুগে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম অথবা প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয় ঘটানো যায় এমন কোনও শিক্ষাপ্রণালী রবীন্দ্রনাথ বার করতে পারেননি। তৃতীয়ত, বিশ্বভারতী মানুষকে ট্রেনিং দেওয়ার সংঘমাত্র যেখানে সুপারম্যানের ম্যানিয়া প্রবেশ করিয়ে মানুষকে অমানুষ করে তোলা হয়। শিবরাম ভাবতেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা নন তাই করতে চেয়েছেন এই বিশ্বভারতীর মাধ্যমে। পরবর্তীকালে অবশ্য 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরী'–র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শিবরাম বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন, '...বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথের অপকর্ম বলে এখন আমি মনে করিনে। মনে করি এটা অপত্যকর্ম। জাতির পিতৃজনোচিত তাঁর বিপুল সৃজনীশক্তির পারাকাষ্ঠা ঠিক এ না হলেও তাঁর বিরাট বাৎসল্যের একটা পরিচয় যে, তার ভুল নেই।'

কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধের পাশাপাশি সমাজ বিবর্তনের সেই স্বপ্নকে সামনে রেখে শোষিত ও সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামকে ঘিরে ভিন্নধারায় নাটক রচনা করেছিলেন শিবরাম। গতানুগতিক পথ থেকে সরে তাঁর 'চাকার নীচে' ও 'যখন কথা বলবে' — একাঙ্কিকা দুটি তৎকালীন বিদগ্ধমহলে আলোড়ন তুলেছিল। এ ছাড়া 'শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুনাট্য (১৯৬৬) গ্রন্থে 'আরো তেরটি' একাঙ্কিকার সন্ধান পাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করতে মানবতার পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন শিবরাম। তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস দু'টির কাহিনির কথকও ছিলেন শিবরাম। তবে 'ভালোবাসার অ আ ক খ', 'প্রজাপতির পক্ষাঘাত', 'প্রেমের পথ ঘোরালো' বা 'দাদু নাতির দৌড়' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে জীবনরহস্যের অনুসন্ধান করতে তাঁর প্রয়াস সেভাবে লক্ষিত হয় না। তাই সেইসব উপন্যাসগুলি সার্থকতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোতে পারেনি।

সাহিত্যের পাশাপাশি সংবাদপত্রের জগতেও তিনি ছিলেন একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। 'সাংবাদিকতা নয়, সংবাদপত্রকে ঘিরেই আমার জীবন' — বলতেন শিবরাম চক্রবর্তী। অভাবের তাড়নায় সংবাদপত্রের হকারি করার পর একসময় 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন শিবরাম। ওই পত্রিকায় কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের কপি তৈরিতেও নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও একসময় 'যুগান্তর' পত্রিকার মালিক হয়েছিলেন শিবরাম। ওই পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার একটি প্যারোডির জন্য সরকার রাজদ্রোহের অভিযোগ শিবরামকে দু'মাসের জন্য কারারুদ্ধ করেছিল। যুগান্তর আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বহরমপুর জেলে থাকাকালীন নজরুল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সান্নিধ্যে এসেছিলেন শিবরাম। 'যুগান্তরে' ইংরেজ–বিরোধী লেখা বেরোয় শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন নজরুল। শিব্রাম তখন সহাস্যে বলেছিলেন, পত্রিকাটিকে যুগান্তর না বলে 'হুজুগান্তর' বলা যেতে পারে। এরপর ছাড়া পেয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষকে মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে শিবরাম 'যুগান্তর'–এর নামস্বত্ব বিক্রি করে দেন।

ভোজন, নিদ্রা আর সিনেমা দেখা — এই তিনটি নেশা ছিল শিবরামের। নিজে খেতে ও অন্যকে খাওয়াতে ভালবাসতেন শিবরাম। পথে চলতে চলতে মুখও চলত তাঁর। বাদাম, চানাচুর, ঘুঘনি, আলুকাবলি, চপ–কাটলেট ইত্যাদির পাশাপাশি বিশেষ পছন্দ ছিল দই ও রাবড়ি। ছোটদের দেখলে লজেন্স, চকোলেট, হরলিক্সের গুঁড়ো, চিনি তাদের হাতে গুঁজে দিতেন। তাঁর নিদ্রাকাতরতার ব্যাপারে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে শিবরাম বলতেন, 'ঘুম ভাঙলেই ওঠার চেষ্টা করি। কিন্তু রাতভর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে সেই ক্লান্তি দূর করতেই আবার একটুখানি ঘুমোতে হয়।' অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় সিনেমার কথা উঠলেই শিবরাম যুক্তি দিতেন — 'সুন্দরী মেয়ে ওই ছায়াছবিতেই যা দেখা যায়।'

ভদ্র, বিনয়ী, মজারু এই হাস্যরসিক লেখক মানুষকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি নিজেকে নিঃশেষ করে অন্যের উপকার করেছেন। বহু পাতানো ভাই–বোন, ভাগ্নে–ভাগ্নির দুঃখ লাঘব করার জন্য, তাদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করার জন্য উদারহস্ত হয়ে দান করেছেন তিনি। তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'–র চলচ্চিত্রে রূপায়ণ করেছিলেন বিখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। এর জন্য দশ হাজার টাকা রয়্যালটি পেয়েছিলেন শিবরাম। গোটা টাকাটা তিনি পাতানো ভাগ্নেকে বইয়ের দোকান করার জন্য দান করে দেন। নানা সংবর্ধনা সভায় বা উপহার পাওয়া ধুতি–শাল–ছাতা–লাঠি তিনি পাতানো নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। পরোপকার করে বহুবার ঠকেছেন তিনি, বেশিরভাগ মানুষই তাঁর ঋণ শোধ করেনি — তবু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি তিনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিবরাম শুধুমাত্র হাস্যরসের কারবারি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও দার্শনিক একজন লেখক। বাংলা সাহিত্যসমাজ তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। সাহিত্যের সমালোচকরা আজও তাঁর প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ও উদাসীন। তবু জীবনকে করতলে নাচাতে নাচাতে, নিজেকে পথের ধুলোর মতো অজ্ঞেয় করে, দুঃখ–হতাশা–গ্লানি প্রভৃতিকে সুনিপুণভাবে হাস্যরসে পরিণত করার চতুরালি তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন বাঙালিকে। তাই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, মুখের কথায়, রঙ্গরসিকতায় এখনও যার নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয় — তিনি আর কেউ নন, তিনি অদ্বিতীয়ম শিব্রাম চকরবরতি।

অঙ্কন ঃ অন্তরা মুখোপাধ্যায়

jsarkar.joy@gmail.com